প্রশ্নঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি লালন পালনের গুরুত্ব ও ফজিলত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

জবাব,

মাতা পিতার কাছে সন্তান কত প্রিয় তা বোঝানোর যোগ্যতা সম্ভবত কোনো মানুষের নেই। ভালোবাসার চূড়ান্ত পরিসীমা বুঝাতেই মানুষ সন্তানের ভালোবাসার উপমা দিয়ে থাকে। এক আরব বেদুঈন কতইনা চমৎকার বলেছে, 'আমার সন্তান তো আমার নিজের কলিজাটিই, যা বক্ষ থেকে বের হয়ে যমিনে চলাফেরা করছে।' কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা বুঝাতে আল্লাহ তাআলা সন্তানের ভালোবাসার কথা দিয়েই বুঝিয়েছেন যে, সন্তান এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সেদিন পিতা মাতার সন্তানেরও খোঁজ রাখার সুযোগ হবে না। মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার সীমা বুঝাতেও কুরআন-হাদীসে সন্তানের এ ভালোবাসা দিয়েই বুঝানো হয়েছে যে, স্বীয় সন্তান থেকেও এঁদেরকে বেশি ভালোবাসতে হবে। জোড়াবদ্ধ হওয়ার পর প্রতিটি জোড়ার এটাই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে তাদের কোল জুড়ে নতুন কেউ আসবে। ফুটফুটে চেহারায় স্বচ্ছ কোমল অন্তর নিয়ে হাসবে। একটু বিলম্ব হলে প্রতীক্ষার প্রহর যে আর শেষ হয় না। অস্থির হয়ে যায়, কখন নতুন মুখটি আসবে। আর যখন সে দুনিয়াতে আসে ঘরের সবাই তো খুশিই, তবে মাতা-পিতার যে কী পরিমাণ খুশি তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। সন্তানটি তাদের কলিজার টুকরা, গর্বের ধন। একে আমাদের মতো করে গড়ে তুলব। তাকে আমরা এটা বানাব ওটা বানাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হল সন্তান নিয়ে ভাবনার এক পিঠ এবং সাধারণত এটিই দৃশ্যমান। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি দিক আছে, এবং সেটিই হল আসল ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা সাধারণত আমাদের ভাবনার বাইরে থেকে যায়। এক সময় মানুষ ছিল না, দুনিয়াও ছিল না। জান্নাত-জাহান্নামও ছিল না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন মানুষ সৃষ্টি করবেন, উদ্দেশ্য- তারা তাঁর ইবাদত-আনুগত্য করবে, নেক কাজ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, অতপর তাঁর ইচ্ছা ও দয়ায় চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাস করবে। তাই তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করলেন, জান্নাত-জাহান্নাম তৈরি করলেন। তো এ মানুষ কীভাবে সৃষ্টি করবেন, তিনি চাইলে তো প্রথম মানুষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে একবারেই একসাথে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেভাবে না করে প্রথমে একজন (আদম আ.) সৃষ্টি করলেন। এরপর তাঁর থেকে তার স্ত্রীকে। অতপর এঁদের থেকে মানুষ সৃষ্টি হবে। এদের থেকে যারা সৃষ্টি হবে তাদের থেকেও একইভাবে মানুষ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষ সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে একসাথে সৃষ্টি না করে এভাবে মা-বাবার মধ্যমে সৃষ্টি করার রহস্য তো অনেক আছে। তবে সাদামাটাভাবে যে হেকমতটি সহজে বোঝা যায় এবং যার ফলাফল সবার সামনে, তা হল এভাবে সৃষ্টিতে মানুষ একে অপরের সাথে সৃষ্টিগতভাবে সম্পৃক্ত হয়, ফলে তাদের মাঝে আত্মীয়তা, হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গতা, একে অপরের সহযোগিতার সম্পর্ক ও টান তৈরি হয়। তাই কেউ কারো পিতা-মাতা হয়, কেউ সন্তান হয়, কেউ ভাই-বোন হয় ইত্যাদি। আজ পুরো মানবজগৎ এভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত। কিয়ামত পর্যন্ত পিতা-মাতার মাধ্যমে যে সন্তানটি দুনিয়াতে আসবে সে আল্লাহ্রই সৃষ্টি- মানব। মানব তাঁরই সে সৃষ্টি, যাকে ইবাদাত-আনুগত্য ও জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টি আল্লাহর, আমার হাতে সে আল্লাহর দেয়া আমানত; সে তো আল্লাহরই খলীফা, যার কথা তিনি ফেরেশতাদেরও বলেছেন। ফেরেশতাগণ নেতিবাচক কথা বললেও তিনি তাদেরকে এমন সৃষ্টির ফয়সালার কথা জানিয়ে দিয়েছেন-

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

-স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রসংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি, যা তোমরা জান না।

(সূরা বাকারা-(২): ৩০)

আল্লাহ তাআলা যখন প্রথম মানবদ্বয়কে দুনিয়াতে অবতরণ করান তখন এ বলে অবতরণ করান-

اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا فَاِمَّا یَاْتِیَنَّكُمْ مِّنِّیْ هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ.

-তোমরা সকলে এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসবে তখন যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে তারা জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। - [সূরা বাকারা (২) : ৩৮-৩৯]

প্রেরিত মানুষ তো এখন শুধু দুজন, কিন্তু বলা হয়েছে, তোমরা সকলে নেমে যাও, উদ্দেশ্য এ দুজনসহ এদের সকল বংশধর। আল্লামা সুয়ূতী রাহ. এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে- وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর ব্যখ্যায় বলেন, أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما অর্থাৎ তোমরা দুজন এবং তোমাদের ঔরসে যত সন্তান আছে সকলে অবতরণ করো। আর এ দুজনসহ আগত সকল সন্তান বা মানবকেই আল্লাহ তাআলা এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, দেখ দুনিয়াতে যাওয়ার পর তোমাদের নিকট আমার হেদায়েত আসবে, আর তোমরা তা গ্রহণ করে নিবে। প্রতিদানে আমি জান্নাত দেব, অন্যথা করলে তোমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাহলে প্রতিটি সন্তান দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে তার প্রতি এ ঘোষণা চলে আসে- সে আল্লাহর খলীফা। আর এজন্যই তিনি প্রতিটি বনী আদমের মাঝে তাঁর ইবাদত-আনুগত্যের, সর্বোপরি হেদায়েত ও জান্নাতের পথে চলার সহজাত যোগ্যতা ও শক্তি দিয়েই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন; কারণ সে তাঁরই খলীফা, তাঁরই প্রিয় সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ হাদীসটি প্রায় সকলেরই জানা, নবীজী বলেন-

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

-প্রতিটি সন্তানই ‘ফিতরাত’-এর উপর (হেদায়েত ও সত্যপথ গ্রহণের সহজাত যোগ্যতা নিয়েই) জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজারী বানায়। -[সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫]

শুধু তাই নয় সহজাতভাবে হেদায়েতের উপর থাকতে যে বিষয়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলা সেগুলো কোনো শিশুকেই (স্বভাবগতভাবে) দেননি, বাকি শিশু যদি পরবর্তীতে পরিবেশ থেকে শিখে নেয় তা ভিন্ন কথা। তো আমার সন্তান, কলিজার টুকরা, যাকে একমাত্র আমার মনে করছি, সে তো আমার হাতে আল্লাহর আমানত- আল্লাহর খলীফা, যাকে আল্লাহ ইবাদত-আখেরাত-জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সে জন্যই আল্লাহ তার মাঝে সে যোগ্যতা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যা দিয়ে সে আল্লাহর নিকট

থেকে এসে পুনরায় আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে পারে। এ হল সন্তান নিয়ে ভাবনার আরেক দিক। আর জানা কথা এবং বাস্তবতাও এই যে, এ দিকটিই হল ভাবনার আসল দিক। সন্তানের আসল রূপ। কেননা আল্লাহ তাআলা এ মানুষের জন্যই দুনিয়ার সবকিছু সৃজন করেছেন, জান্নাত সাজিয়েছেন, জাহান্নাম বানিয়েছেন। এক সময় সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র মানুষই বাকি থাকবে। দুনিয়া তো নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, আসল না। আসল তো আখেরাত। কিন্তু হয় কী! যে দিকটি মূল সে দিকে আমরা খুব কমই ভ্রুক্ষেপ করি। ভাবি না যে, সে আল্লাহরও, সে তো আল্লাহর খলীফা। আমরা সাধারণত ভাবি- এ আমার সন্তান সুতরাং তাকে আমি একান্ত আমার ইচ্ছা অনুসারে গড়ব। কে আছে বাধা দেয়ার, কার কী বলার আছে! তার উপর একমাত্র অধিকার আমার। কিন্তু যদি একটু ভেবে দেখি কে তাকে সৃষ্টি করেছেন। যাকে একমাত্র আমার মনে করছি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মেধা ও শক্তি-সামর্থ্যসহ তার পুরো অস্তিত্ব কে দান করেছেন? পৃথিবীতে আগমনের পর তার জীবনের জন্য আলো-বাতাস-ভূমিসহ যাবতীয় আবশ্যকীয় উপকরণ কে দান করেছেন? আমি না আল্লাহ? আমি শুধু তাকে বহন করেছি, লালন-পালন করেছি। তাহলে এখন সন্তানকে কার ইচ্ছা অনুযায়ী লালন-পালন করা হবে? আমার ইচ্ছা, না আল্লাহ্র ইচ্ছা? আমি সন্তানকে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে লালন-পালন করছি; বিজাতীয় কালচারে তাকে গড়ে তুলছি। কাল আমার আদরের সন্তানই যদি আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করে আমাকে সম্বোধন করে বলে- আমি অবুঝ ছিলাম তোমরা কেন আমার পথ জান্নাত থেকে ঘুরিয়ে দিলে, দ্বীন কবুলের আমার সহজাত শক্তিকে কেন বিনষ্ট করে দিলে? আমাকে যদি ছোটবেলা থেকেই আমার সহজাত পথে রাখতে এবং আমাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করতে, তাহলে আজ আমার এ অবস্থা হত না। তা না করে কেন তোমরা আমাকে বিপথগামী করলে? তখন আমরা কী জবাব দেব? ইমাম মালেক রাহ. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার স্ত্রী মারা গেলে মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী আমাকে সান্ত¡না দিতে আসেন এবং বলেন, বনী ইসরাঈলে একজন বড় আলেম ছিলেন, খুব ইবাদত বন্দেগী করতেন, মানুষ তার নিকট মাসআলা-মাসায়েল জানতে আসত। তার একজন স্ত্রী ছিল, সে তাকে খুব ভালোবাসত, একদিন স্ত্রী মারা যায়। তখন তিনি এমন ব্যথিত হলেন যে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একটি ঘরে থাকতে লাগলেন এবং দরজা লাগিয়ে দিলেন, কাউকে তিনি সাক্ষাৎ দিচ্ছেন না, সবাই অনেক চেষ্টা করেও তাকে বুঝাতে পারছেন না। অবশেষে একজন মহিলা বিষয়টি জানলেন এবং ঐ আলেমের ঘরের সামনে গেলেন, আর লোকজনকে বললেন আমি একটি মাসআলা জানতে এসেছি, যা ঐ আলেম ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে হবে না। আমাকেই তার সাথে সরাসরি কথা বলতে হবে। এ বলে মহিলা দরজায় বসে থাকতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন আমাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেই হবে। তখন এক লোক আওয়াজ দিয়ে আলেমকে বললেন, একজন মহিলা এসেছে তার নাকি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতেই হবে, সে আপনার দরজায় পড়ে রয়েছে, কোনোভাবেই সরছে না। তখন আলেম অনুমতি দিলে মহিলাটি বলল, আমি একটি মাসআলা জানতে এসেছি। আলেম বললেন, কী মাসআলা? মহিলাটি বললেন, আমি আমার প্রতিবেশী এক নারী থেকে অলংকার ধার নেই এবং অনেক দিন পর্যন্ত তা ব্যবহার করি। এরপর তারা আমার নিকট লোক প্রেরণ করে তা ফেরৎ নেয়ার জন্য, আমি কি এখন তা ফেরত দেব? আলেম বললেন, আল্লাহর শপথ, অবশ্যই। মহিলা বললেন, সেটি তো আমার কাছে অনেক দিন ছিল এবং আমি তা আমার নিজের মত করে ব্যবহার করেছি। আলেম বলেন, তারা তোমাকে সেগুলো অনেক দিন পর্যন্ত ধার দিলেও তারাই ওটার মালিক। তখন মহিলা বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আল্লাহ আপনাকে যা ধার দিয়েছেন অতপর তা নিয়ে গেছেন, ঐ কারণে আপনি শোকার্ত হচ্ছেন। অথচ তিনিই সেটির মালিক! আলেম তখন নিজের বিষয়টি বুঝতে পারলেন। আল্লাহ ঐ নারীর মাধ্যমে তাকে অনেক উপকৃত করলেন। -[মুয়াত্তা মালেক, জানাইয অধ্যায়, হাদীস ৫৫৯] । আমাদের ভাবা দরকার, আমাদের সন্তান কি একান্তই আমাদের নাকি

আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত? তারা কি শুধু আমারই সন্তান, না আল্লাহর খলীফা? তাই তাদের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপদ্ধতি কী এবং কী হওয়া দরকার; গুরুত্বের সাথে ভাবা উচিত।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُو نَ مَا يُؤْمَرُونَ.

-হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোরস্বভাব, কঠিনহৃদয় ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। -[সূরা তাহরীম (৬৬): ৬]

উত্তম তারবিয়াত পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক ।যেমন মাতা-পিতার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই জানা উচিত, তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সন্তানের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন হতে হবে। আর তাদের দ্বীনী তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দ্বীনী তারবিয়াত করা, পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান পিতা-মাতার উপর ফরয। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার উপর সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর যে বিষয় অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হাঁ, নফল বা মুস্তাহাব কাজে সে এখতিয়ার থাকে। ফরয বা ওয়াজিব আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

হযরত সাহবান মাহমুদ রাহ. স্বীয় কিতাব ‘তারবিয়াতে আওলাদ’-এর কারণ উল্লেখ করেন যে, সন্তানের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি তার বাল্যকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার উপর এই হুকুম বর্তায় যে, তাকে উত্তম তারবিয়াত কর।

এই জন্য পিতা-মাতা যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা না দেয় এবং সন্তান এভাবেই তরবিয়াতহীনভাবে বেড়ে ওঠে, পরে শরীয়তের মুকাল্লাফ হওয়ার পর তার থেকে গোনাহ প্রকাশ হতে থাকে তাহলে মাতা-পিতার অবহেলাও যেহেতু তার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার একটা উপলক্ষ বা কারণ তাই তার ওই গোনাহগার সন্তানের সাথে সাথে মাতা-পিতাও গোনাহগাররূপে গণ্য হবে।

সন্তানের ত্রূটি-বিচ্যুতি দেখে চুপ থাকা

উদাহরণ স্বরূপ নাবালেগ সন্তান বালেগ হওয়ার পরও নামায পড়ে না। রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না, মেয়েরা পর্দা করে না। সবাই স্বেচ্ছাচারিতার সাথে জীবন-যাপন করে, আর মা-বাবা বসে বসে তা দেখে, কিছুই বলে না। বরং মাঝে মাঝে বলে যে, আমরা তো আমাদের দায়িত্ব পালন করে দিয়েছি। মনে রাখবেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি। বরং আমরা আমাদের দায়িত্বে অনেক অবহেলা করেছি, করছি এবং করেই চলছি। যার ফলে দিন দিন আমাদের গোনাহের কুফল বেড়েই চলেছে।

মনে রাখবেন, মা-বাবা যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় আর সন্তান-সন্তুতি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গোনাহে লিপ্ত থাকে তাহলেও মা-বাবা -যদি দায়িত্বে অবহেলা করে থাকেন- তাদের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে এর কিছু দায়ভার তাদের উপরও বর্তাবে।

আমাদের সকলেরই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি আমাদেরকে কেবল এই দায়িত্ব দেননি যে, নিজে শরীয়তের পাবন্দ হব এবং আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করব। বরং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এমনকি অধীনস্থদেরসহ সবার জিম্মাদারী আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দিয়েছেন।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং পরিবারকে বাঁচাও। আর এই জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় হল, সন্তানের প্রতি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হকসমূহ পালন করা। আর এই হুকুক সন্তান জন্মলাভের পর থেইে শুরু হয়ে যায়।

সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। –সূরা আনফাল (৮) : ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন–

واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। –তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণা–

ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيَّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন–

وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। –সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, ‘শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।’ সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

বক্ষমাণ প্রবন্ধে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে :

এক. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। হাদীস শরীফের ইরশাদ–

ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكّ فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা(-মাতা)র দুআ, মুসাফিরের দুআ ও মজলুমের দুআ। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমন–

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু‘আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেন–

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু‘আ কবুল করে নিন। –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার মা দুআ করেছিলেন–

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ... وَ اِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، وَ اِنِّيْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল,... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। −সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৬

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান−

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। −সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৮

তিনি আরো দুআ করেন− হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং (বলেন−)

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। −সূরা মারইয়াম (১৯) : ৬

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন−

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। −সূরা আসসাফফাত (৩৭) : ১০০

হযরত মারইয়াম রা.-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন−

رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। −সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৫

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে−

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। −সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

দুই. শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা

জন্মের পর থেকে নবজাতকের কানে এমন সব শব্দবাক্য বলতে থাকা, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পয়দা করবে এবং দ্বীন-ধর্মের ভালবাসা সৃষ্টি করবে। এজন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া হয়।

আবু রাফে রা. বলেন−

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ফাতেমা রা.-এর পুত্র হাসান ইবনে আলীর জন্ম হলে তার কানে আযান দিয়েছেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১০৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৯৪

আযানের মধ্যে কী আছে? আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য, শিশুর কানে সুযোগে সুযোগে এমন শব্দ-বাক্য দেওয়া, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জাগ্রত রাখবে, তাঁর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং আখেরাতের কামিয়াবির জন্য তার মন-মানসিতাকে প্রস্তুত করবে।

সালাফে সালেহীন তথা মহান পূর্বসূরীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোট বেলায় দ্বীনের মৌলিক অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতেন। তাঁদের একটা নীতি ছিল–

كانوا يستحبون أن يُلَقِّنُوْا الصبي يُعْرِبُ أولَ ما يتكلم يقول : لا إله إلا الله سبع مرات، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ শিশু স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে সক্ষম হলে তার কানের নিকট সাতবার لا إله إلا الله পড়তেন। ফলে শিশু সর্বপ্রথম যা উচ্চারণ করত তা হল لا إله إلا الله । –মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৩৫১৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৯৬৭

মোটকথা, প্রিয় সন্তান যেন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিশুকাল থেকেই মেহনত করতে হবে। তাকে আল্লাহর গুণাবলির কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেককার বান্দাদের কর্ম ও বাণি শোনাতে হবে।

তিন. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া

সুন্দর উপদেশ কী ? এখানে আমরা এর দু'টি নমুনা পেশ করছি–

ক. হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। –তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত পছন্দ হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে :

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই– এই কথার শিক্ষা দেওয়া। এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ–

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ : يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। –সূরা লুকমান (৩১) : ১৩

২. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ। বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন– সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। –সূরা লুকমান (৩১) : ১৬

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ। নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। –সূরা লুকমান (৩১) ১৭

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। –সূরা লুকমান (৩১) : ১৮

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা।

وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। –সূরা লুকমান (৩১) : ১৯

লুকমান হামীক তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন–

يا غلامُ! ألا أعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهن!

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

احفظ الله يحفظْك، احفظ الله تجده أمامك.

তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলে সচেষ্ট হও, বিপদ-আপদে তিনি তোমার পাশে থাকবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন।

২. আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মহব্বত লাভ করা।

تعرّف إليه في الرّخاء يعرِفْك في الشدة.

সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রাখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

অর্থাৎ সুখ ও আনন্দের সয়ম আল্লাহ তাআলার ইবাদত-উপাসনা করে তাঁর মহব্বত ও পরিচয় অর্জন করো, দুঃখ ও মসিবতের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করা।

إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯

অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় যত কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হবে। তাঁর কাছেই চাইবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই।

واعلم أن الأمة لو اجْتَمَعَت على أن يَنْفَعُوْك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كَتَبَه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

জেনে রেখো, জগতের সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পৃথিবীর সবাই একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে এর চেয়ে বেশি পারবে না, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। –প্রাগুক্ত

৫. তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رُفعت الأقلام وجَفّت الصحُف.

(তাকদীর লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুকিয়ে গেছে। (এতে আর রদবদল হবে না।) –প্রাগুক্ত

অর্থাৎ তোমার জীবনে ভালো ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যত অবস্থা আসবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং সে লেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ সব হালতেই তুমি আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি থাকো।

واعلم أن ما أَصابك لم يكُنْ لِيُخْطِئَك، وأن ما أَخْطأَك لم يكن لِيُصِيْبَك.

স্মরণ রেখো, তোমার কাছে (ভালো বা মন্দ) যা এসেছে তা তোমার থেকে দূর হওয়ার ছিল না এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা তোমার নিকট আসার ছিল না। –মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ৬৩৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৭৫৮

৬. দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। বিভিন্ন সময় বান্দা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন সবর করা।

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرَج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

জেনে রেখো, অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। নিশ্চয় সবর করলে সাহায্য আসে, কষ্টের পর আরাম আসে এবং সংকটের পর প্রশস্ততা আসে। −মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪

লক্ষ করুন, এককেটা নসীহত কত মূল্যবান! একটি শিশুর হৃদয়ে যদি এ উপদেশমালা গেঁথে যায় জীবনের সফলতার জন্য আর কী চাই! প্রতিটি নসীহতই আলোকবর্তিকা। এভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশু ইবনে আব্বাসের ঈমানী মানস গঠন করেছেন।

নবীজীর নসীহতের পূর্বাপর লক্ষ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামনে আসবে। তা হল− শিশুর সামনে নসীহত পেশ করার আগে সে যেন আগ্রহের সাথে তা কবুল করে সে অবস্থা ও মানসিকতা তৈরি করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ করে শিশু ইবনে আব্বাসকে নসীহত শোনাতে আরম্ভ করেননি। এর আগে ইবনে আব্বাস রা.-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।

তিনি তাকে নিজ সওয়ারীতে উঠিয়েছেন। নিজের সাথে বসিয়েছেন। এতে শিশু ইবনে আব্বাসের মন ভরে উঠেছে। নবীজীর প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে। তারপর তার পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর ‘ইয়া গোলাম’ বলে আদুরে সম্বোধন করেছেন। তারপর উপদেশ পেশ করার আগেই সেগুলোর লাভ শুনিয়ে দেওয়া, উপদেশের প্রতি আগ্রহি করে তুলেছেন− ‘এগুলো দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।’ এসবের পর যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর মনে পুরোপুরি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন একটা একটা করে সবক’টি নসীহত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে তা হল− শিশুকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের লাভের বিবরণ দেওয়া। যাতে নিজ আগ্রহে সে কাজটি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সাথে সাথে এর লাভ বলেছেন যে, এতে করে আল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকবেন, তোমার সাহায্য করবেন।

তদ্রূপ শিশুকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এ কাজের ক্ষতির দিকটাও আলোচনা করা। এতে করে শিশুর মনে মন্দ স্বভাবের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে।

লুকমান হাকীমের হেকমতপূর্ণ উপদেশগুলো আবার একটু লক্ষ করুন− যে কয়টি কাজ থেকে তিনি সন্তানকে বিরত রাখতে চেয়েছেন, প্রত্যেকটির সাথে ঐ আচরণের মন্দ দিকেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

শিরক সম্পর্কে বলেছেন− নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। অহংকারের ব্যাপারে বলেছেন− নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উচুঁ কর্কশ আওয়াজের ব্যাপারে বলেছেন− নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর।

সুতরাং আমরা শিশুদের প্রতি শুধু ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেই থেমে যাব না; বরং এর সাথে ভালোর লাভ ও মন্দের ক্ষতির কিছু কিছু দিকও তার সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফীক দানকারী।

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহতগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, শিশুর জীবন গঠনের জন্য তিনি যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা হল− আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক কায়েম করে দেওয়া। শিশুর জীবন সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

শিশুকে বিভিন্ন উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সুস্বাদু ফল খাওয়ার পর বলুন, আব্বু! দেখেছ, আল্লাহ আমাদের জন্য কী মিষ্টি ফল সৃষ্টি করেছেন! মজাদার খাবার গ্রহণের পর বলুন, বাবা! আমরা যদি নামায পড়ি, কুরআন শিখি, আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তাহলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি মজাদার খাবার দান করবেন।

শিশুর মাঝে সৎ স্বভাব জাগ্রত করতে তাকে বলুন– সত্য কথা বল, আল্লাহ খুশি হবেন। মানুষের খেদমত কর, আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন।

মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন– মিথ্যা বল না, কারণ আল্লাহ মিথ্যুককে পছন্দ করেন না। ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে আল্লাহ নারায হবেন।

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলুন, মাশাআল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ। আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের খুব ভালবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে পারেন– না, এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করুন– আমীন।

দুটি ক্ষেত্র এমন রয়েছে, যেখানে নারীর অবদান সবচাইতে বেশি। ইসলাম এক্ষেত্রে নারীকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ দুই অঙ্গনে একজন নারী যে ভূমিকা রাখতে সক্ষম, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। উম্মাহর আগামী প্রজন্মের কেবল অস্তিত্ব রক্ষায় নয়; তাদের চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং আদর্শ ও নৈতিকতার সুরক্ষায় মৌলিক অবদান রাখেন মায়েরা। এক্ষেত্রে তারা ভিত্তিমূলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যুগে যুগে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন তারাই। গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়টি তাদের সহায়তায় নয়; বরং মূল কর্মযজ্ঞটা তাদের হাত ধরেই হতে হয়। নতুবা মানবতা ও মনুষ্যত্বের ধারা (প্রকৃতপক্ষে যা উম্মাহর প্রকৃত মূল্য ও অবস্থান এবং তার অস্তিত্বের প্রয়োজন ও গুরুত্বের স্বাক্ষর বহন করে।) টিকে থাকতে পারে না।

যে দুটি ক্ষেত্রের কথা বলতে চাইছি, তা হল-

এক. শিশুর দ্বীনী তালীম-তরবিয়ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রথম পাঠটা তাকে রপ্ত করিয়ে দিন। তার দিল ও দেমাগে ঈমান ও ইসলাম খোদাই করে দিন এবং দ্বীনী চেতনা ও মূল্যবোধ তার মাঝে প্রোথিত করে দিন।

দুই. ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের হেফাযত করুন এবং বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারের ছোবল থেকে সন্তানকে রক্ষা করুন।

কোনো অভ্যাস বা বিশ্বাস কিংবা কোনো ভালো-মন্দ অথবা যে কোনো বিষয় যদি কারো মন-মগজে বসে যায় তখন আমরা সেটাকে আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় বলি 'য়ে চীয ঘুট্টি ম্যাঁ পড়ি হ্যয়'। অর্থাৎ অস্থি-মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে যা স্বভাবে পরিণত হয় তাকেই

বলা হয় ‘ঘুট্টি ম্যাঁ ব্যঠ জানা’। তো একটি শিশু যখন অল্পস্বল্প বুঝতে আরম্ভ করে তখন তার ‘ঘুট্টিতে’ কী প্রোথিত হবে আর কী হবে না-এ দায়িত্বটা আঞ্জাম দিতে হয় মাকে এবং ঘরের অন্যান্য মুরব্বী মামী-চাচী, খালা-ফুফু ও দাদী-নানীদেরকে। ঘরোয়া পরিবেশে অনায়াসেই তারা তা আদায় করতে পারেন।

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে জোর দিয়েই বলে থাকেন, শিশুর দিল-দেমাগের স্বচ্ছ শ্লেটে যে রেখাই টানো না কেন তা অঙ্কিত হয়ে যায়। আর বিলীন হয় না। অনেকসময় মনে হয়, হয়ত তা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা বিলকুল উধাও হয়ে যায় না। কোনো কারণে চাপা পড়তে পারে। কিন্তু সময় মতো তা আবার ফুটে ওঠে, জেগে ওঠে।

এভাবে চিন্তা করলে সন্তানের প্রতি মা ও ঘরের অন্যান্য নারীদের কর্তব্য অনেকাংশে বেড়ে যায়। তারা খুব সহজে শিশুর নির্মল অন্তরে পবিত্র আল্পনা আঁকতে পারেন। পরবর্তীতে কোনো শক্তি, কোনো চক্রান্ত, কোনো শিক্ষা, কোনো দীক্ষা, কোনো সভ্যতা, কোনো সংস্কৃতি, কোনো ধরনের কোনো কিছু খুব সহজে তা মুছে দিতে পারবে না। মিটিয়ে দিতে পারবে না।

মা ও শিশুর সেবা ও দেখভালে নিয়োজিত নারীগণ এবং ঘরের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগণ, পরিবারে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে, এতটুকুতেই আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না যে, বাচ্চাকে আল্লাহ-রাসূলের নাম শিখিয়ে দিলেন। কালিমা মুখস্থ করিয়ে দিলেন। নামাযের বয়স ঘনিয়ে এসেছে নামাযে অভ্যস্ত করলেন। কুরআন শরীফ শিখিয়ে দিলেন। এমনকি উর্দুও পড়িয়ে দিলেন। এখন তো হিন্দি চর্চা দৌরাত্ম্যে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অসংখ্য মুসলিম শিশু এক লাইন উর্দুও পড়তে পারে না। এমনকি নিজের নামটাও লিখতে পারে না। এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। ইন্টারভিউ দিতে গেলে, স্কুলে ভর্তি হতে গেলে কিংবা কোথাও চাকরির আবেদন করতে গেলে এ হালত দেখা যায়। তো আজকাল মুসলিম ঘরগুলো থেকেই উর্দু শেখানোর ক্ষেত্রে অবহেলা এবং সীরাতে আম্বিয়া, সীরাতে ছাহাবা, আযওয়াজে মুতাহহারাহ তথা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ, আহলে বাইত তথা নবীজীর পরিবার-পরিজন এবং ইসলামের মহান মনীষীদের নাম-পরিচয় এবং ইসলামের ইহিহাস সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে আজ এ সঙ্কটময় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

তো যাই হোক, শিশুকে কালিমা, নামায, তিলাওয়াত শিখিয়ে দেওয়া, তাকে আল্লাহ-রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এই কাজগুলোর পাশাপাশি শিশুকে এ তরবিয়তেও গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে কুফর ও শিরক চিনতে পারে, এর অসারতা অনুধাবন করতে পারে এবং এর প্রতি বিতৃষ্ণ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে। তাওহীদের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখে এবং এর প্রতি মহব্বত রাখে। মুসলিম পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। ঈমান-ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারায় পুলক অনুভব করে। দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হয়। আল্লাহর আনুগত্যে অটল-অবিচল থাকে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশক ও মহব্বতে দিওয়ানা থাকে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা বোধ করে। পার্থিব উৎকর্ষকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে না করে এবং একেই চ‚ড়ান্ত সফলতা জ্ঞান না করে। সততাপূর্ণ জীবন যাপন, সত্যবাদিতার অভ্যাস, পরোপকারিতা ও পরার্থপরতার আগ্রহ, সৃষ্টির সেবার মানসিকতা এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাও তাদের দায়িত্ব।

একটি শিশু এই দীক্ষা যদি ঘর থেকে লাভ করতে না পারে তাহলে বিশ্বের নামিদামি বিদ্যাপীঠ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বড় বড় প্রতিষ্ঠানও তাকে সেই সবক দিতে পারবে না। দিলেও কাঙ্ক্ষিক্ষত ফলাফল লাভ হবে না।

এখানে একথাটিও পরিষ্কার করতে চাই, মুসলিম শিশুর অন্তরে কুফর-শিরক ও ইলহাদ এবং পৌত্তলিকতা ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি-চাই তা বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে হোক কিংবা দেশীয় পুরাণ চর্চার মাধ্যমে, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাব্যবস্থার কারণে হোক অথবা প্রিন্ট ও

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে, কোনো লেকচার শুনে বা শিট পড়ে হোক অথবা কারো খপ্পরে পড়ে, দ্বীন সম্পর্কে বে-খবর থাকার কারণে হোক অথবা জাগতিক ফয়দা সিদ্ধির জন্যে, ইহবাদী সম্প্রদায়ের সংশ্রবে হোক কিংবা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কোনো প্রভাবে, যে সূত্রই এর উৎস হোক না কেন একজন মুসলিম শিশুর অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রতি, নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাবোধ জাগ্রত হতে হবে; যেমনটি হয়ে থাকে কোনো নাপাক ও দুর্গন্ধ বস্তুর ক্ষেত্রে। নতুবা তার ঈমান ও দ্বীনী মূল্যবোধের সুরক্ষা হবে না। তার ব্যাপারে একজন সহীহ আকীদাসম্পন্ন মুসলিম সত্তার জামানত দেওয়া যাবে না।

ভক্তি ও ঘৃণার এ অনুভ‚তি তাকে মুসলিম ঘর থেকেই জাগ্রত করতে হবে। এমন তরবিয়তেই তাকে গড়ে তুলতে হবে, যাতে ঈমান ও তাওহীদের প্রতি আকর্ষণ এবং শিরক-কুফর ও ইলহাদের প্রতি ঘৃণাবোধ তার অস্থি-মজ্জায় মিশে যায়। একটি মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্য এতেই নিহিত। আর এভাবেই হতে পারে আগামী প্রজন্মের মনুষ্যত্ব ও মুসলমানিত্বের সুরক্ষা। শিশুর অন্তরে এ বিষয়গুলো গেঁথে দেওয়ার মূল ভ‚মিকা রয়েছে ঘরের মায়েদের, বড় বোনদের, মামী-খালা, চাচী-ফুফুদের, নানী-দাদী এবং মুরব্বী নারীদের। যদি মায়ের আঁচল থেকে শিশু এ দীক্ষা লাভ না করে তাহলে বিশাল বিশাল ওয়াজ মাহফিল, চমৎকার চমৎকার দ্বীনী কিতাব, বড় বড় উলামা-মাশায়েখের হাত ধরেও ব্যাপকভাবে তা হাছিল করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

[দ্রষ্টব্য: তামীরে হায়াত, ২৫ মে ১৯৯২ ঈসাব্দ (ইসলাম মে আওরত কা দরজা আওর উসকে হুকুক ও ফারায়েয, পৃ. ২৩০-২৩২)

সুপ্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি বোন/ ভাই,

উপরোক্ত আলোচনা, হাদীস থেকে বুঝা যায় যে ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান সন্ততি লালন পালনের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম।

(আল্লাহই ভালো জানেন।)

তথ্যসুত্রঃ

- তামীরে হায়াত, ২৫ মে ১৯৯২ ঈসাব্দ (ইসলাম মে আওরত কা দরজা আওর উসকে হুকুক ও ফারায়েয, পৃ. ২৩০-২৩২
- শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন - মাসিক আলকাউসার (alkawsar.com)
- সন্তানের কল্যাণকামনা - মাসিক আলকাউসার (alkawsar.com)

- সন্তানের তরবিয়ত : ইসলামের এক জরুরি বিধান - মাসিক আলকাউসার (alkawsar.com)

নাম- রিফাত সানজিদা মুনজারীন

আইডি- ২০১০২০৯৫

ব্যাচ- ২০১

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

ঠিকানা -২৬/১,অভয়দাসলেন, টিকাটুলি, ঢাকা -১২০৩

ফোন- ০১৫২১৫৬৯৭৫৬